Department: Sanskrit HONS

Semester: I I

Paper: SANH- CC- T-III

Teacher: Dr. Amrita Sihi

Scanned with CamScanner

: Topic বাণভট্ট ও শূদ্রকনামোপাখ্যান :

বাৎস্যায়নগোত্রীয় চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র বাণ হর্ষচরিত ও কাদম্বরী নামক দুইখানি গদ্যকাব্য রচনা করেন। প্রথমটি আখ্যায়িকা, দ্বিতীয়টি কথা। হর্ষচরিতের প্রথম আড়াই উচ্ছ্বাসে ও কাদম্বরীর প্রথম কয়েকটি শ্লোকে বাণ বিশদ-ভাবে তাঁহার জীবনের অনেক কথাই বলেছেন। অতি বাল্যকালে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় এবং মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তিনি পিতাকেও হারান। পিতার মৃত্যুর পর বালক বাণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকেন। বহুদিন বিদেশ ভ্রমণ করে তিনি গৃহে ফিরে আসেন। একদিন হর্ষবর্ধনের রাজসভায় তাঁর ডাক পড়ে, হর্ষের ভ্রাতা কৃষ্ণের সহায়তায় তিনি রাজসভায় গৃহীত হন এবং শীঘ্রই রাজার আদরের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

হর্ষচরিতে বাণ মহারাজ হর্ষের যেটুকু ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তার সঙ্গে চীনা-পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ লিখিত রাজা হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যের বিবরণ তুলনা করলে মনে হয় কনৌজেশ্বর হর্ষবর্ধন শীলাদিত্যই (৬১০-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন বাণের পৃষ্ঠপোষক। অনুমান করা হয়, হর্ষের রাজত্বকালের প্রথম

...

আগে বাণ হর্ষের সংস্পর্শে আসেন এবং তখন বাণের বয়স খুব কম। ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাণের আবির্ভাবকাল বলে মনে করেছেন তাঁরা সকলেই ঐরূপ অনুমান করেছেন। ভ্রাতৃঘাতীর উপর প্রতিশোধ নেবার পর হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন, একথা বাণ বলে গেছেন। সুতরাং মনে হয়, হর্ষের রাজত্বের প্রথম ভাগে বাণ তাঁর সংস্পর্শে আসলেও হর্ষচরিত যখন তিনি রচনা করেন তখন হর্ষের রাজত্বের শেষভাগ। আমরা জানি, ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষের রাজত্বের অবসান হয়। কাজেই ঐ সময়ের অল্প পূর্বেই বাণ হর্ষচরিত রচনা করেছিলেন।

বাণের বংশাবলী

ব্রহ্মা
|
পুলহঃ
|
বাৎস্যঃ
|
কুবেরঃ
|
অচ্যুতঃ ঈশানঃ হরঃ পাশুপতঃ
|
অর্থপতিঃ
|
চিত্রভানুঃ
|
বাণভট্টঃ
|
ভূষণভট্টঃ
(নামান্তর ভূষণবাণঃ, পুলিন্দঃ, পুলিনঃ)

সারাংশ

উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড়। তাঁর পুত্র চন্দ্রাপীড়। রাজার পরম বিজ্ঞ মন্ত্রী হলেন শুকনাস। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় গুরুগৃহে থেকে বিদ্যার্জন শেষ করে বাড়ি ফিরে এলে পিতা তারাপীড় তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছুক হলেন। অভিষেকের আগে চন্দ্রাপীড় পিতৃপ্রতিম সচিবশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শুকনাসের সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি চন্দ্রাপীড়কে অত্যন্ত সমুচিত কিছু উপদেশ দান করেন, যাতে চন্দ্রাপীড় একজন যথার্থ প্রজানুরঞ্জক রাজা হয়ে উঠতে পারেন।

পণ্ডিতপ্রবর শুকনাস শুরুতেই উপদেশ দানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন — ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব শক্তি এবং যৌবন মানুষকে বিবেকবর্জিত করে তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। যদিও রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও ধীর, তবুও তার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নতুন যৌবন, অনুপম সৌন্দর্য, অসাধারণ শক্তি ও জন্মের পরই যে প্রভুত্ব — প্রত্যেকটি ভয়ংকর। আবার এই তিনটি যদি একসঙ্গে একজনের মধ্যে আবির্ভূত হয় তবে তো আর কথাই নেই। কারণ শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেও যৌবনে বুদ্ধি কলুষিত হয়। আর-একবার বিষয়বৈভবের স্বাদ পেলে হৃদয়ে আর কোনো উপদেশ প্রবেশ করে না। চন্দ্রাপীড়ের এখনও বিষয়ের নেশা জমেনি। তাই এ সময়ই তার উপদেশ লাভের উপযুক্ত সময়।

সদ্‌বংশে জন্ম অথবা শাস্ত্রজ্ঞান দুষ্প্রবৃত্তিকে দমাতে পারে না। কারণ শীতল সমুদ্র জলেও বড়বানল জ্বলে ওঠে। গুরুর উপদেশ, মানুষের সব নোংরা পরিষ্কাররূপ জলহীন স্নান, জরাহীন বার্ধক্য এবং উদ্‌বেগহীন জীবন। রাজাদের পক্ষে এইরূপ উপদেশের খুবই প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেউ সাহস করে উপদেশ দেয় না। কারণ ধনরত্ন ও নানা সুবিধা পাওয়ার আশায় সকলেই প্রায় রাজার তোষামোদ করে থাকে।

আদর্শ রাজার সর্বপ্রথম কাজ হল রাজলক্ষ্মীর কুৎসিত রীতিনীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের লক্ষ্মীকে অনেক কষ্টে লাভ করতে হয় এবং বহু যত্নে একে পালন করতে হয়। এই লক্ষ্মী যেন নিষ্ঠুরতা শিক্ষা করার জন্য বীর যোদ্ধাদের তরবারির ধারে বাস করে। সমুদ্রমন্থনকালে একসঙ্গে ক্ষীর সমুদ্র থেকে উঠেছিল লক্ষ্মী, পারিজাত, চন্দ্র, কালকূট বিষ, কৌস্তভমণি প্রভৃতি। এইসব বস্তুর একত্রে অবস্থানহেতু লক্ষ্মী পারিজাত থেকে অনুরাগ, চাঁদের কাছ থেকে বক্রতা, উচ্চৈঃশ্রবার কাছ থেকে চাঞ্চল্য, কালকূট বিষের কাছ থেকে মোহনশক্তি, মদ্যের কাছ থেকে মাদকতা, কৌস্তভমণির কাছ থেকে নিষ্ঠুরতা সঙ্গে নিয়েই যেন আবির্ভূত হয়েছিল।

এই লক্ষ্মী নীচ প্রকৃতির। শত চেষ্টা করেও একে চিরদিন বেঁধে রাখা যায় না। লক্ষ্মী কোনো লোককেই আদর করে না। কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, রূপ দেখে না, কুলক্রমের অনুসরণ করে না, স্বভাবের প্রতি লক্ষ রাখে না, দক্ষতার আদর করে না, শাস্ত্রজ্ঞান শুনতে চায় না, ধর্মের মর্যাদা রাখে না, দানশক্তির আদর করে না, বিশেষ

Scanned with CamScanner

অভিজ্ঞতার বিচার করে না, আচার মানে না, সত্য বোঝে না, শুভ লক্ষণকে অনুসরণ করে না, মেঘের গন্ধর্বনগর রেখার মতো দেখতে দেখতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। নিষ্ফল ক্রিয়া হয়েও অসৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। সময়ময় এক রাজাকে ছেড়ে অন্য রাজাকে আশ্রয় করে। এর স্বভাব গঙ্গার মতো চঞ্চলা, অন্ধকার গুহার মতো তমোগুণযুক্তা, আর বিদ্যুতের মতো অল্পস্থায়ী।

এই লক্ষ্মী ইন্দ্রজাল দেখাতে দেখাতে যেন এই পৃথিবীতে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম সমন্বিত নিজের চরিত্র প্রকাশ করে। অমৃতের সহোদরা হয়েও বিষতুল্যা, সম্পদের অহংকারে গরম করেও জড়তা আনে, উন্নতি ঘটিয়েও নীচতা জন্মায়, শিব হয়েও অশিব স্বভাব বিস্তার করে, বলবৃদ্ধি ঘটিয়েও স্বভাবকে লঘু বা চপল করে, যেখানে যত বেশি লক্ষ্মীর আবির্ভাব, সেখানে তত বেশি কুকীর্তি বিরাজ করে। এর সাহায্যে মানুষের সমস্ত মহৎ গুণ নষ্ট হয়ে যায়। মোহ এসে আশ্রয় নেয়।

এই দুরাচারিণী লক্ষ্মীর প্রভাবে রাজাদের চিত্ত কলুষিত হয়, তাঁদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। তাঁদের সমস্ত মহৎ গুণগুলি বিনষ্ট হয়। ফলে তাঁদের চালচলন, আচার-ব্যবহার অন্য রকমের হয়। কেউ সম্পদের মোহে নিশ্চল হয়ে যান। কেউ মদনশরে মর্মাহত হয়ে নানা মুখভঙ্গি করেন, কেউ ধনমদে মত্ত হয়ে নানা ভ্রূভঙ্গি করেন, কেউ বা নিজের অজ্ঞের ভার বইতে না-পেরে পঙ্গুর মতো অপরের সহায়তায় চলাফেরা করেন, সামনের বস্তুকে চিনতে পারেন না। তাঁরা নিজেদের পরিণাম বুঝতে পারেন না। মহামন্ত্র পাঠেও তাঁদের চৈতন্যোদয় হয় না। লক্ষ্মীর প্রভাবে নানা কুকর্মে লিপ্ত থেকে দিনের পর দিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাই শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে লক্ষ্মীর স্বভাব ও ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন।

পণ্ডিতপ্রবর মন্ত্রী শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে দুরাচারিণী লক্ষ্মীর কুস্বভাবের কথা বলার পর ধূর্তদের কথা বলেছেন। এইসব স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রীক, ধনলুব্ধ মাংসখেকো শকুনের মতো ধূর্তেরা পদ্মমধু লোকের মতো রাজসভায় থেকে রাজাদের দোষগুলিকে গুণ বলে প্রতিপন্ন করে নিজেদের সুবিধা আদায় করে। তারা রাজাদের বোঝায় — পাশাখেলা তো আমোদ, মৃগয়া হল ব্যায়াম, মদ্যপান হল বিলাসিতা, প্রমত্ততা হল বীরত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা হল প্রভুত্ব, চঞ্চলতা হল উৎসাহ, নিজ-স্ত্রী পরিত্যাগ হল অনাসক্তি, গুরুর উপদেশ অমান্য করা হল পরের অধীনতা অস্বীকার করা, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও বেশ্যাতে আসক্তি হল রসিকতা, গুরুতর অপরাধ শুনেও প্রতিকার না-করা হল মহানুভবতা, অপমান সহ্য করা হল ক্ষমাগুণ, দেবতাকে অপমান করা নিজের মহাশক্তির প্রকাশ — এইভাবে নিজেদের চরিত্রের সমস্ত দোষগুলিকে গুণরূপে স্তাবকদের বা চাটুকারদের মুখে শুনতে শুনতে রাজারা নিজেদের মহান বলে মনে করেন।

এমনিতেই রাজারা ধনমদমত্ত, উন্মার্গগামী প্রায়, তার উপর ধূর্তদের মিথ্যা স্তবস্তুতি তাঁদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করে তোলে। ফলে রাজন্যবর্গ নিজেদের ঈশ্বরের অবতার, অতিমানব ও তাঁদের মধ্যে দেবতা বাস করেন — এইরূপ ভেবে দেবতার মতো নানা কাজ করতে গিয়ে লোকেদের উপহাসের পাত্র হন। তাঁরা মনে করেন তাঁরা সকলেই স্বয়ং চতুর্ভুজ নারায়ণ, শিবের মতো তাঁদের ললাটেও তৃতীয় নয়ন আছে। এইভাবে মিথ্যা আত্মমহিমায় স্ফীত হয়ে অন্যের সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, কারও প্রতি দৃষ্টিপাত করাও যেন বরদান বলে মনে করেন। অন্যকে স্পর্শ করলে ভাবেন তাকে পবিত্র করে দিলেন।

মিথ্যা মাহাত্ম্যের অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে রাজারা দেবতাদের প্রণাম করেন না, ব্রাহ্মণদের পুজো করেন না, মান্য ব্যক্তিদের সম্মান করেন না, পূজনীয়দের পুজো করেন না, গুরুজনদের সম্মানে উঠে দাঁড়ান না, বিদ্বানেরা অনর্থক পরিশ্রমে নিজেদের বিষয় ভোগসুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন বলে তাঁদের উপহাস করেন, অভিজ্ঞ বৃদ্ধের উপদেশকে প্রলাপ বলেন। মন্ত্রীদের উপদেশে তাঁরা বিরক্ত হন, শুভার্থীর কথায় তাঁদের রাগ হয়। এঁরা সন্তুষ্ট হন সেইসব লোকেদের প্রতি, যারা নিষ্কর্মার মতো কাছে বসে থেকে দিনরাত করজোড়ে ইষ্টদেবতার সেইসব রাজাদের স্তবস্তুতি করে। ফলে রাজারা শুধু তাদের কথাই বলেন, ভাবেন এবং সমস্ত সুযোগসুবিধা দান করেন। যৌবরাজ্যে অভিষেকের আগে উপযুক্ত সময়ে যথার্থ হিতৈষী পিতৃসম পণ্ডিতপ্রবর শুকনাস এইভাবে অত্যন্ত সমুচিত উপদেশ দান করলেন, যেহেতু উপদেশের পাত্রও যেমন দুর্লভ, তার চেয়েও বেশি শোচনীয় গুণবানের স্খলন।

Scanned with CamScanner